নূতনে পুরাতনে

ইংরাজি শিখিযা, য়ুরোপের সভ্যতা ও সাধনার বাহিরটা দেখিয়া, একদিন আমরা নিজেদের সভ্যতা ও সাধনার প্রতি অনেকটা বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম। ইহার জন্য একটুও দুঃখ করি না। গতানুগতিক শ্রদ্ধাটুকু একবার একরূপভাবে ভাঙ্গিয়া না গেলে সত্যশ্রদ্ধালাভ কখনই সম্ভব হইত না।

তখন আমাদের চক্ষে বিদেশের প্রায় সকলই ভাল লাগিত, আর স্বদেশের প্রায় সকলই স্বল্পবিস্তর মন্দ ঠেকিত। সে ভাবটা ক্রমে কাটিয়া গিয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন, একদিন যেমন আমরা স্বদেশের যাহা কিছু তাহাকেই হীনচক্ষে দেখিতাম, আজ বুঝি সেইরূপ বিচারবিবেচনা-বিরহিত হইয়াই, স্বদেশের যাহা কিছু তাহাকেই ভাল বলিয়া ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছি। একদিন আমরা বেড়া ভাঙ্গিয়া ঘর ছাড়িয়া পলাইযাছিলাম; আজ সে দিকে বাড়ি খাইয়া, ফিরিয়া আসিয়া ঐ পুরাতন ঘরকেই অচলায়তন করিয়া তুলিতেছি। সত্য কথাটা তাহা নয়

যথন আমরা ঘর ছাড়িয়া বাহিরের দিকে ছুটিয়াছিলাম, তখন ঐরূপ বাহিরে যাওয়াই আমাদের মঙ্গলের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। যে সকল মমতা কাটাইয়া কোনও দিন ঘরের বাহিরে চলিয়া যায় না, সে ঘরের মর্য্যাদাও কখনও বুঝিতে পারে না। প্রবাসের বেদনা ও পরদেশীর উপেক্ষা সহিয়াই লোকে আপনার ঘর ও আপনার জন যে কি বস্তু, ইহা সত্যভাবে বুঝিতে পারে। যে ঘরের কোণে বসিয়া থাকে, কিম্বা হদ্দমুদ্দ উঠানে যাইয়া নিরাপদে দাঁড়াইয়া দূরের পথের আবছায়ার ধ্যান করে, তার পক্ষে এ জ্ঞানলাভ সম্ভব হয় না।

ফলতঃ, যে মন বাহিরে ছুটিয়া গিয়াছিল সেই যে ঘরে ফিরিয়া আসে, তাহাও নহে। সেই মানুষই আসে বটে, কিন্তু সে মন আসে না। নূতন প্রেম, নূতন দৃষ্টি লইয়া সে ঘরে ফিরিয়া আইসে।

আগে যে বস্তুকে যে চক্ষে দেখিত, সেই চক্ষেই যে এখনও দেখে, তাহা নয়। সে চক্ষু থাকিলে, সেই ভাবও থাকিত। সে ভাব থাকিলে, সে পুরাতন অভক্তিও থাকিত। ভাবের পরিবর্ত্তন না হইলে, যেখানে অশ্রদ্ধা ছিল, সেখানে শ্রদ্ধা জাগে না।

"শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়"। আমাদের স্বদেশের প্রতি এই বিশ্বাস বাড়িয়া গিয়াছে। এই নববিশ্বাসই আমাদের নূতন স্বাদেশিকতার প্রাণ। আর কেবল বর্ত্তমানের সত্যের উপরেই নহে, কিন্তু ভবিষ্যতের সম্ভাবনার উপরেও এই নূতন বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। কা'র ভিতরে কতটা কি সম্ভাবনা আছে, ইহা দেখিতে হইলে, প্রেমের কাজল চক্ষে মাখিতে হয়। লোকে বলে বটে, প্রেম অন্ধ; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে প্রেম যতটা দেখে, অপ্রেম বা ঔদাসীন্য তার শতাংশের একাংশও দেখিতে পায় না। অপ্রেম অপূর্ণতাই খুঁজিয়া বেড়ায়, কারণ যাহা দেখিতেছে তাহার মধ্যে সুন্দর ও পরিপূর্ণ কিছুই নাই, এই জ্ঞান বা ধারণাকে আশ্রয় করিয়াই অপ্রেম বাঁচিয়া থাকে। যার জীবনের জন্য যে বস্তুর যেটুকু প্রয়োজন সে তা'ই খুঁজিয়া নেয়। আর অপ্রেম যেমন বস্তুর মন্দটাই দেখে, ঔদাসীন্য সেইরূপ বস্তুর উপরটা মাত্র দেখে। এক প্রেমই বস্তুর সকলটা দেখে, ছায়ার সঙ্গে তার আতপটুকুও দেখে, মন্দের সঙ্গে তার ভালটুকুও দেখে, বস্তুটা যেমন আছে, তারই সঙ্গে সঙ্গে কিরূপে, তাহা কত বড়, কত সুন্দর হইতে পারে, ইহাও প্রত্যক্ষ করে। বস্তুর সমগ্র জ্ঞানের উপরেই প্রেম গড়িয়া উঠে। সুতরাং প্রেম যতটা দেখে, আর কেউ ততটা দেখিতে পারে না।

স্বদেশকে আমরা যখন অশ্রদ্ধা করিতাম, তখন তাহার প্রতি আমাদের এই প্রেম জন্মায় নাই। প্রেমের অভাবে তার বাহিরটাই কেবল দেখিয়াছিলাম, ভিতরটা দেখিতে পাই নাই, তার এক দেশ মাত্রই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, সমগ্রকে চাক্ষুষ করিতে পারি নাই। আজ নূতন প্রেমে সেই পূর্ণবস্তুকে দেখিতেছি বলিয়াই, তার

মন্দের সঙ্গেই যে ভালটুকুও জড়াইয়া আছে, তাহাও প্রত্যক্ষ করিতেছি। আর ঐ ভালটুকুর জন্যই জোর করিয়া মন্দটুকুর উপরে আঘাত করিতে ভয় পাই।

ফলতঃ, ভাল মন্দ দুটা এমন একান্ত বিচ্ছিন্ন বস্তু নয় যে, একটাকে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আর একটাকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারা যায়। টানাহিঁচড়া করিয়া কোনও জীবন্ত বস্তুর গঠনগত বা প্রকৃতিগত ভালমন্দকে পরস্পর হইতে পৃথক্ করা যায় না। জীবন্ত বস্তুর ভালটাকে বাড়াইয়া দিয়া ও ফুটাইয়া তুলিয়াই ক্রমে ক্রমে তার মন্দটাকে নিরস্ত করিতে হয়। এক্ষেত্রে আর কোনও উপায়ান্তর নাই। জোরাবরি করিলে শেষে জীবের জীবন লইয়াই টান পড়ে।

এই জন্যই জোরজবরদস্তি করিয়া কাহাকেও ভাল করিতে ভয় পাই। নিজের পুত্র কন্যার উপরেও জোর চালাইতে চাহি না, নিজের সমাজের উপরেও নয়। যার প্রকৃতিতে যা নাই, বাহির হইতে বা উপর হইতে তার উপরে তাহা চাপাইতে গেলে তাহাতে কোনও ইষ্ট হয় না, বরং অনিষ্টেরই আশঙ্কা বেশী হইয়া থাকে।

এক দিন এই জ্ঞান জন্মায় নাই। তাই য়ুরোপের ভালটাকে তখন জোর করিয়া আমাদের নিজেদের সমাজের ঘাড়ে চাপাইয়া, তাহাকে য়ুরোপের মতন করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলাম। য়ুরোপ যে য়ুরোপ, আর ভারত যে ভারত, এরা যে দুইটা বিশিষ্ট সমাজ, এবং বিশিষ্ট বলিয়াই যে ইহাদের নিজস্ব একটা অন্তঃপ্রকৃতি, এবং সেই প্রকৃতি অনুযায়ী এক একটা বহির্গঠন আছে; আর সমগ্র, সম্পূর্ণ, মনুষ্যত্বের গোটা বীজটা যে সমভাবে উভয় সমাজের গর্ভেই নিহিত রহিয়াছে; ঐ বীজকে ফুটাইয়া তুলা যে উভয়েরই সমান লক্ষ্য, উহাতেই যে উভয় সমাজেরই চরম সার্থকতা,—এ সকল কথা তখন বুঝি নাই। বৈষম্যের ভিতর দিয়াই যে সাম্য, বিচিত্রতার মধ্য দিয়াই যে প্রকৃত একত্ব আপনাকে নিয়ত অভিব্যক্ত করিয়া থাকে; বৈষম্য না থাকিলে সাম্য যে অবস্তুতে, আর বিচিত্রতা না থাকিলে একত্ব যে শূন্যত্ব শূন্যত্ব

প্রভৃতির ন্যায় কেবল একটা ভাববাচ্যের পদে পরিণত হয়, একথা তখনও জানি নাই। সুতরাং খোদার উপর খোদকারি করিতে যাইয়া দুনিয়াটাকে একাকার করিতে চাহিয়াছিলাম। ঐ মায়া এখন কাটিয়া গিয়াছে। দুনিয়াটা সংস্কারকের সৃষ্টিও নয়, আর সংস্কারকের হাত পাকাইবার জন্য সৃষ্টও হয় নাই। সুতরাং দুনিয়ার ভাল করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া দুনিয়া-শুদ্ধ লোককে মন্দ বলিতেও আর প্রবৃত্তি হয় না।

এই ভাল-মন্দ জড়াইয়াই দুনিয়ার সত্য ভালটা গড়িয়া উঠে। পচাধচাটাকে কোনও দিনই বোধ হয় কেউ ভাল বলে না। অথচ বীজ প্রত্যক্ষতঃ যতক্ষণ না পচিতে আরম্ভ করে, ততক্ষণ তার অঙ্কুর-জাত হয় না। অদ্যকার মন্দ অনেক সময় কল্যকার ভালরই অগ্র-দূত হইয়া আইসে। সকল সাধুরা এই কথা বলিয়াই ত জীবকে সান্ত্বনা দিয়া থাকেন। আখেরী ভালর উপরে তাঁদের অটল আস্থা আছে; আমাদের নাই বলিয়াই আমরা পদে পদে এত বিচলিত হইয়া পড়ি।

আমাদের নিজেদের প্রকৃতির ভিতরে, আমাদের সমাজেরও প্রাণের মূলে, তার পক্ষে যাহা ভাল, আর দুনিয়ার পক্ষে যাহা ভাল, তাহা সকলই বীজাকারে লুকাইয়া আছে। এই ভালটাকে সংগ্রহ করিবার জন্য ছুটাছুটি করিয়া বাহিরে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন। এ কথাটা এক দিন জানি নাই ও বুঝি নাই বলিয়াই স্বদেশের দিকে পিছন ফিরিয়া বিদে-শের দিকে ছুটিয়াছিলাম। তবে ছুটিয়াছিলামও ভালরই জন্য। ঐ ভ্রান্তিটুকু না হইলে আজ যে সত্য লাভ করিয়াছি, তাহারও পরীক্ষা হইত না। আমাদের ভাল যে আমাদের ভিতরেই আছে, তাহাকে ভিতর হইতেই ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, বাহির হইতে মাগিয়া আনা নিষ্প্র-জন, ইহা বুঝিবার জন্যই বাহিরে গিয়া ভিতরের ভালটাকে একবার খুঁজিতে হয়। ইহা বিধাতারই বিধান। ঐ ভুল করিয়াছিলাম বলিয়াই এই সত্যটাকে আজ ভাল করিয়া বুঝিয়াছি।

ইংরাজি পড়িয়া য়ুরোপের সভ্যতার রূপরসে মুগ্ধ হইয়া আমরা স্বদেশের সভ্যতা ও সাধনার সঙ্গে একটা বিরোধ বাধাইয়া বাহিরে ছুটিয়া গিয়াই এই সত্যটা লাভ করিয়াছি বলিয়া, সেই বিরোধের জন্য কিছুমাত্র দুঃখ করি না। ঐটি না হইলে এইটিও হইত না। আজ আমরা একটা বৃহত্তর, উচ্চতর, গভীরতর সমন্বয়ের পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। ঐ বিরোধটা বাধাইয়াই এই সমন্বয়ের সন্ধান পাইয়াছি। আজিকার এই সমন্বয়ের পথে দাঁড়াইয়া, পূর্ব্বকার ঐ বিরোধকে জাগাইয়া রাখা বা চাগাইয়া তোলা যেমন অসঙ্গত ও অনিষ্টকর, সেইরূপ ঐ বিরোধ হইতেই যে এই সমন্বয়ের সম্ভাবনা উৎপন্ন হইয়াছে, এই কথাটা ভুলিয়া যাওয়া বা অস্বীকার করাও অন্যায়। যারা আজিও ঐ পুরাতন বিরোধকেই সামান্য খুঁটিনাটি ধরিয়া জাগাইয়া রাখিতে চাহে, তারা যেমন এই সমন্বয়ের বাধা জন্মাইতেছে, অন্য দিকে যারা ঐ বিরোধটার মূল্য অস্বীকার করে, তারাও এই সমন্বয়ের প্রকৃত মর্ম্ম যে কি ইহা জানে না ও বোঝে না। ঐ বিরোধের মূল্য যে বোঝে না, এই সমন্বয়ের মর্য্যাদাই বা সে জানিবে কিসে?

সমন্বয় মাত্রেই, যে বিরোধের নিষ্পত্তি করিতে যায়, তার বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষেরই পূর্ণ দাবীদাওয়া কিছু কাটিয়া ছাটিয়া একটা মধ্যপথ ধরিয়া তাহার ন্যায্য মীমাংসা করিয়া দেয়। সুতরাং এই সমন্বয়মুখে পূর্ব্বে আমরা যে দিকে ছুটিয়া যাইতেছিলাম, তার কিছু পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু কোনও সমন্বয়ই বিপরীত পথ ধরিয়া চলে না। গতির বেগটা একটু কমাইয়া বা তার মুখটা একটু ঘুরাইয়া দিলেও, প্রকৃত সমন্বয় মাত্রেই বস্তুকে তার মূল গন্তব্যের দিকেই বাড়াইয়া দেয়। সমন্বয় প্রত্যাবর্ত্তন নহে, অগ্রসর; প্রতিক্রিয়া নহে, বিকাশ। সমন্বয় মাত্রেই পূর্ব্বকার বিরোধের মূল লক্ষ্যকে সাধন করে, তাহাকে একেবারে নিরর্থক করিয়া দেয় না। মানুষের মন ও মানবসমাজ কেমন করিয়া যে বিকাশের পথে চলে, এইটী যাঁরা ভাল করিয়া তলাইয়া দেখেন না, তাঁরাই কেবল কার্পণ্যাভিভূত হইয়া এই

সমন্বয়-চেষ্টাকে প্রত্যাবর্ত্তন বা প্রতিক্রিয়া বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকেন।

তালগাছের মতন মানুষের মন বা মানবসমাজ একটা সরল-রেখার ন্যায় ঊর্দ্ধদিকে উন্নতির পথে চলে না; আর ঘড়ির পেণ্ডুলাম্ বা পরিদোলকের মতনও একবার বামে আরবার দক্ষিণে দোল খায় না। কিন্তু ঐ তালগাছে কোন সতেজ ব্রততী যেমন তাহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া উপরের দিকে উঠে, সেইরূপই মানুষের মন ও মানবের সমাজ ক্রমোন্নতির পথে চলিয়া থাকে। একটা লম্বা সরল খুঁটার গায়ে নীচ হইতে উপর পর্য্যন্ত একগাছা দড়ি জড়াইতে হইলে যেমন তাহাকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া নিতে হয়, মানুষের মনের ও মানবসমাজের ক্রমবিকাশের পন্থাও কতকটা তারই মতন। এই গতির ঝোঁকটা সর্ব্বদাই উন্নতির দিকে থাকিলেও, প্রতি স্তরেই, উপরে উঠিবার জন্যই, একটু করিয়া নীচেও নামিয়া আসিতে হয়। ইংরাজিতে এরূপ তির্য্যক-গতির একটা বিশিষ্ট নাম আছে,—ইহাকে স্পাইর‍্যাল মোষণ spiral motion বলে। সমাজ বিকাশের ক্রমও এইরূপ স্পাইর‍্যাল, একান্ত সরল নহে। এ গতিতে ঠিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া, একবার বামে ঝুঁকিয়া, আবার দক্ষিণে ছুটিয়া যাওয়ার মতন কোনও কিছু নাই। ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার গতি, কিম্বা পরিদোলকের গতির জন্য একটা সমতল ক্ষেত্রের প্রয়োজন। এইভাবে এক স্তর হইতে অন্যতর ও উচ্চতর স্তরে যাওয়া যায় না। আপনার গতি-বেগের অবি-চ্ছিন্নতা রক্ষা করিয়া এক স্তর হইতে অন্য স্তরে যাইতে হইলেই ঐ ঊর্দ্ধ-মুখী তির্য্যকগতির পথ অনুসরণ করিতে হয়। মানুষের মন ও মানুষের সমাজ যে ক্রমাগতই এরূপ এক স্তর ছাড়াইয়া অন্য স্তরে, এক ধাপ অতিক্রম করিয়া অন্যতর ও উচ্চতর ধাপে যাইতেছে, ইহা ত প্রত্যক্ষ কথা। সুতরাং এক্ষেত্রে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া শব্দে কোনও মতেই সত্যবস্তুকে নির্দ্দেশ করিতে পারে না।

এই জন্যই বলি, বর্ত্তমানে আমরা যে সমন্বয়ের মুখে আসিয়া

দাঁড়াইয়াছি, তারই জন্য পূর্ব্বকার বিরোধটা অত্যাবশ্যক ছিল। এই সমন্বয়ের মুখে আমরা ফিরিয়া নহে, অগ্রসর হইয়াই আসিয়াছি। ঐ বিরোধের পূর্ব্বে আমাদের দেশের সভ্যতা ও সাধনা যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, আজ তার চাইতে অনেক উচ্চ স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আমার দেশ-ভক্তি বা পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রতি শ্রদ্ধা এই সত্য কথাটা স্বীকার করিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হয় না।

আজ দেশব্যাপী যে একটা সতেজ স্বাদেশিকভাব জাগিয়াছে, ইহা ত অস্বীকার করা যায় না। এই নূতন স্বাদেশিকতা যে আমাদের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী পূর্ব্বপুরুষদিগের স্বাদেশিকতা হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ, তাই কি অস্বীকার করিতে পারি? আর এই যুগের প্রথমে আমরা বিদেশীয় ভাবের প্রেরণায় স্বদেশের সঙ্গে যে বিরোধটা বাধাইয়াছিলাম, তাহা যদি না বাধিত, তবে এই শ্রেষ্ঠতর স্বাদেশিকতার কোনই সন্ধান যে আমরা পাইতাম না, ইহাও অস্বীকার করা যায় কি?

আজ আমরা আমাদের স্বদেশের সভ্যতা ও সাধনাকে অল্পে অল্পে প্রত্যক্ষভাবে চিনিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমাদের অব্যবহিত-পূর্ব্ব-পুরুষেরা এই প্রত্যক্ষ-জ্ঞানলাভ করেন নাই। যাহা চলিয়া আসিতেছিল, তাহাকেই তাঁরা সত্য ও সঙ্গত বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন। দেশের রীতিনীতি, আচার-বিচার, ক্রিয়া-কর্ম্ম, এ সকলকে তাঁরা নিষ্ঠাপূর্ব্বক মাথায় করিয়া বহিয়াছেন; কিন্তু কোনও দিন বোধ হয় মাথা হইতে নামাইয়া নিজেদের চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখেন নাই। আর যে বস্তুকে কেবলই মাথায় করিয়া রাখা যায়, চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় না, তার যথার্থ জ্ঞানলাভ কদাপি সম্ভবে না।

বস্তুর তত্ত্ব-নিরূপণ ও উপলব্ধির সত্যাসত্য নির্দ্ধারণকেই আমাদের দার্শনিক পরিভাষায় পরীক্ষা কহে। এই পরীক্ষা ব্যতীত প্রকৃত জ্ঞান জন্মে না। আবার সন্দেহ ব্যতীত পরীক্ষার প্রয়োজনও উপস্থিত হয় না। দরজার সামনে অন্ধকারে একটা লম্বা সরু বস্তু পড়িয়া আছে দেখিয়া, ইহা দড়ি না সাপ, এই সন্দেহ উপস্থিত হইলেই আলো আনিয়া

তাহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখি। দড়ি বা সাপ এ দু'এর কোনও একটা ধারণা স্থির থাকিলে এ ব্যর্থশ্রম-স্বীকার কেহ করে না। অতএব পরীক্ষা ব্যতীত যেমন জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হয় না, সেইরূপ জিজ্ঞাসা ব্যতীত পরীক্ষারও সূত্রপাত হয় না। আমাদের অব্যবহিত পূর্ব্বপুরুষদিগের মনে নিজেদের সভ্যতা ও সাধনা, আচার ও অনুষ্ঠান, ধর্ম্ম ও কর্ম্মাদির প্রতি একটা কোমল শ্রদ্ধামাত্র ছিল, কোনও কোনও স্থলে একটা গভীর ভক্তি পর্য্যন্তও দেখা গিয়াছে। শাস্ত্রযুক্তি না জানিয়াও কেবলমাত্র গতানুগতিক রীতিকে আশ্রয় করিয়া যে শ্রদ্ধা জন্মে, তাহাকেই কোমল শ্রদ্ধা কহে। আমাদের শাস্ত্রে এই কোমল-শ্রদ্ধাবান লোকদিগকে নিকৃষ্ট অধিকারী বলিয়াছেন। তবে সাধন বলে

"ক্রমে ক্রমে তিঁহ ভক্ত হইবেন উত্তম—'

এই আশ্বাসও দিয়াছেন। আর জিজ্ঞাসাই এই উত্তম অধিকারলাভের পথে প্রথম অবস্থা। কিন্তু আমাদের অব্যবহিত-পূর্ব্বপুরুষদিগের এই জিজ্ঞাসার উদয় হয় নাই। যাহা প্রচলিত তাহাই প্রামাণ্য, যাহা আছে তাহাই শ্রেষ্ঠ, যাহা চলিয়া আসিয়াছে তাহাই সনাতন; তাঁরা এইটুকু মাত্র বিশ্বাস করিতেন। এগুলি যে অসত্য বা সত্যাভাস, নিকৃষ্ট ও অধুনাতন হইতেও বা পারে, তখন পর্য্যন্ত কাহারো মনে এই সন্দেহের উদয় হয় নাই। সন্দেহ না জাগিলে জিজ্ঞাসার, জিজ্ঞাসা না জাগিলে পরীক্ষার প্রবৃত্তি হয় না। এই জিজ্ঞাসা ব্যতীত সত্যসন্ধিৎসা, সত্যসন্ধিৎসা ব্যতীত সাধনে একাগ্রতাও জন্মে না। একাগ্রতা না জন্মিলে ত্যাগের শক্তি জাগে না। ত্যাগের শক্তি না জাগিলে সংস্কারবর্জ্জনের সাহস, আর সংস্কারবর্জ্জন না করিলে সম্যক বিচারের অধিকার, এবং বিচার ব্যতীত কদাপি সত্যের প্রতিষ্ঠা হয় না।

ইংরাজি শিখিয়া, য়ুরোপীয় সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, ইতিহাসাদির পুথি-গত বিদ্যা অর্জ্জন করিয়া, আমাদের নিজেদের ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য ও শিল্পাদি সম্বন্ধে এই জিজ্ঞাসার উদয় হয়। এখানে নিজেদের ঘরে যাহা দেখিতেছিলাম, ওখানে ঐ সকল গ্রন্থে আর সাহেবদের আচার-

আচরণে তার বিপরীত সব দেখিতে লাগিলাম। আমাদের শাস্ত্রের অর্থ তখন কেহ আমাদিগকে কহেন নাই; কহিবার মতন লোকও দেশে বেশী ছিলেন কি না সন্দেহ। উহাদের শাস্ত্রসাহিত্যের মর্ম্ম আমাদের চক্ষের সম্মুখেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। উহাদের ভাব ও আদর্শ যে কি ইহা আমরা স্বল্পবিস্তর বুঝিতে পরিতাম; আমাদের রীতিনীতির মর্ম্ম যে কি, ইহা কিছুই বুঝিতাম না। উহাদের বাহিরের শিক্ষা আমাদের সকল বাঁধন আল্‌গা করিয়া দিত; আর আমাদের ঘরের শাসন কেবলই চারিদিকে আমাদিগকে কষিয়া বাঁধিবার চেষ্টা করিত। এক দিকে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা. অপরদিকে কঠোর আনুগত্য। একদিকে ভোগ, অপর দিকে ত্যাগ। এক দিকে প্রত্যক্ষ রূপরসাদি, অপর দিকে অপ্রত্যক্ষ স্বর্গমোক্ষ। এক দিকে প্রবৃত্তির মোলায়েম প্ররোচনা, অপর দিকে নিবৃত্তির নির্ম্মম শাসন। এই দুই শক্তির মাঝখানে পড়িয়া আমরা যে যৌবনের সহজটানে আমাদের ঘরের বাঁধন কাটিয়া ঐ বাহিরের মুক্তির সন্ধানে ছুটিলাম, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে।

কারণ, ঐ স্বাধীনতাই যৌবনের স্ব-ধর্ম্ম। বিধির বিধানেই মানুষ যৌবনের প্রেরণায় বহির্বিষয়ের রূপরসের মাঝে আপনার ভিতরকার সার্থকতা খুঁজিয়া থাকে। আমাদের নিজেদের সভ্যতায় ও সমাজে এই সহজ যৌবন-ধর্ম্মের উপযোগী সাধন সে সময়ে একপ্রকার লোপই পাইয়াছিল। যুবা বৃদ্ধ সকলে একই বিধি-নিষেধের বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, আশ্রমবিহীন হইয়া, কেবলমাত্র বর্ণভেদে পরিণত হইয়াছিল। কৈশোরে ব্রহ্মচর্য্য, যৌবনে গার্হস্থ্য, প্রৌঢ়ে বানপ্রস্থ, বার্দ্ধক্যে সন্ন্যাস,—এসকলের কোনও কিছু ছিল না; ছিল কেবল বিধি-নিগড়বদ্ধ গার্হস্থ্য, আর অস্বাভাবিক মর্কট বৈরাগ্য ও উচ্ছৃঙ্খল সহজীয়া সন্ন্যাস। শাস্ত্র ছিল, তার অর্থ কেহ জানিত না; আচার ছিল, তার বিচার কেহ করিত না। ধর্ম্ম ছিল, তার মর্ম্ম কেহ বুঝিত না। সমাজ একদিকে মানুষের সহজ ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলিকে নিষ্পেষণ করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিত, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত কাম্যকর্ম্মজাল,

পূজা-অর্চ্চনার সংকল্প ও প্রার্থনার ভিতর দিয়া—"রূপং দেহি, ধনং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি"—বলিয়া সকল সংসার-কামনাকে প্রদীপ্ত করিয়া দিত।

আমরা যে আকস্মিক উল্কাপাতের মতন পূর্ব্বাপর সম্পর্কশূন্য হইয়া আকাশ হইতে এদেশের মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছিলাম, তাহা নহে। আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের দোষগুণের বোঝা মাথায় লইয়া তাঁহাদের কর্ম্মভারক্ষয় করিবার জন্যই এদেশে আসিয়া জন্মিলাম। ঐ বিধির বাঁধনের ভিতরেই এবং ঐ সমাজশাসন সত্বেও, তাঁহাদের মর্ম্মে মর্ম্মে যে সকল কামনা ও বাসনা শুষ্ক-নির্ঝরগর্ভে গুপ্ত-ফোয়ারার মতন দিবানিশি স্ফুরিত হইত তাহাই আমাদের এই নূতন শিক্ষা ও সাধনার প্রেরণায় বাহিরে ছুটিয়া আসিল। তাঁরা যাহা চাহিতেন, কিন্তু পাইতেন না; যে বন্ধনের ক্লেশই তাঁরা অনুভব করিতেন, কিন্তু তাহাকে কাটিয়া ছিঁড়িয়া মুক্ত হইবার মতন শক্তি ও সাহস তাঁদের ছিল না; আমরা এই নব-শিক্ষায় নূতন শৌর্য্য অর্জ্জন করিয়া সেই বস্তুর পশ্চাতে প্রকাশ্যে ছুটিয়া গেলাম এবং অবলীলাক্রমে সেই বন্ধন ছিন্ন করিয়া আপনাদের যৌবনকে সার্থক করিতে লাগিলাম। যে শক্তির সাহায্যে আমরা স্বদেশের সভ্যতা ও সাধনার বন্ধনকে কাটিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে লাগিলাম, সে শক্তিও মূলে আমাদেরই দেশের, বিদেশের নহে। ইহাকে স্বাধীনতাই বলি, আর স্বেচ্ছাচারই বলি, যাই বলি না কেন, ইহার উদ্দীপনা মাত্র কেবল বিদেশের শিক্ষা-দীক্ষা হইতে আসিয়াছিল, মূলে শক্তিটা স্বদেশেরই সভ্যতা ও সাধনার। পূর্ব্বপুরুষদিগের যে বাসনা চরিতার্থ হয় নাই, তাহাই এই শক্তিকে আশ্রয় করিয়া আমাদের জীবনে নিজ নিজ চরিতার্থতা অন্বেষণ করিতে লাগিল। কোনও শিক্ষাদীক্ষাতেই মূল রক্তের বাঁধনটা নষ্ট করিতে পারে না। সুতরাং আমরা এই বিদ্রোহের মুখেও স্বদেশের ভিতরকার প্রাণস্রোত হইতে একান্ত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে পারিলাম না। এই যোগটা একেবারে বিচ্ছিন্ন হইলে আজিকার এই সমন্বয়ের সম্ভাবনা

পর্য্যন্ত থাকিত না। সমন্বয় বিরোধের নিষ্পত্তি করে, সামাজিক-সমন্বয় সমাজগতিকে অবিচ্ছিন্ন রাখিয়াই পরিবর্ত্তিত আধার ও আবেষ্টনের সঙ্গে তাহাকে মিলাইয়া দেয়। সমন্বয় পুরাতনকে পূর্ণ করে, বিনাশ করে না ; নূতনকে সার্থক করে, সংহার করে না।

এই সমন্বয়-পন্থাকে অনুসরণ করিয়াই আমাদের দর্শনশাস্ত্র সকল মীমাংসার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ধর্ম্মমীমাংসা বা পূর্ব্বমীমাংসা এবং ব্রহ্ম-মীমাংসা বা উত্তরমীমাংসা, উভয় দর্শনই এই সমন্বয়ের প্রণালীর অনুসরণ করিয়াছেন। উভয়েই প্রথমে শাস্ত্র মানিয়া লইয়াছেন, শাস্ত্রের স্বতঃ প্রমাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। সকল বিজ্ঞানই এইরূপে আপনার মূল তত্ত্বগুলিকে মানিয়া লয়। গণিত দেশকালের অস্তিত্ব, আর এই দেশ কালের যে একদিকে অন্ত নাই ও অন্যদিকে এরা অনন্তভাগে বিভক্ত হইতে পারে—এই তত্ত্বগুলি মানিয়া লইয়া তবে আপনার যাবতীয় সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিয়াছে। গণিতের সকল বিচার ও যুক্তি এই কয়টা তত্ত্বকে মানিয়া লইয়া তাহাকে আশ্রয় করিয়াই চলিয়াছে। জড়বিজ্ঞান সেইরূপ জড়বস্তুর অস্তিত্ব ও যাহাকে আমরা সচরাচর জড়ের গুণ বা ধর্ম্ম বলি, তাহার সত্যতা স্বীকার করিয়া লই-যাই আপনার সর্ব্বপ্রকারের বিচার-পরীক্ষায়, গণনা ও গবেষণায় নিযুক্ত হইয়া থাকে। এইরূপ আমাদের মীমাংসাদর্শনও শাস্ত্র যে স্বতঃ প্রামাণ্য এইটি মানিয়া লইয়াছেন। পূর্ব্বমীমাংসা বেদের কর্ম্মকাণ্ড-কেই, আর উত্তরমীমাংসা তাহার জ্ঞানকণ্ডকেই, একমাত্র প্রামাণ্য শাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়া বিচারযুক্তি প্রয়োগে নিজ নিজ বিশিষ্ট সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। শাস্ত্র উভয়েরই মূল। তাহারপর, এই শাস্ত্রার্থ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসার বা সন্দেহের উৎপত্তি। এই জিজ্ঞাসাই মীমাংসার প্রয়োজন প্রমাণ করে। এইজন্য এই জিজ্ঞাসাই উভয় মীমাংসার প্রথম ও আদি কথা। পূর্ব্বমীমাংসা "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা," আর উত্তরমীমাংসা "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"—বলিয়াই আপনাদের দর্শনের প্রয়োজন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ধর্ম্ম কি, আর ধর্ম্ম নয় কি ; ব্রহ্ম

কি, আর ব্রহ্ম কি নয়; এই বিষয়ে সন্দেহই এই জিজ্ঞাসার মর্ম্ম। এই সন্দেহ হইতে বিচার। এই বিচার হইতে সঙ্গতি। আর এই সঙ্গতির পরে সমন্বয়ের প্রতিষ্ঠা হয়।

—এই পাঁচ পায়ের উপরে আমাদের ধর্ম্ম-মীমাংসা ও ব্রহ্ম-মীমাংসা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সামাজিক জীবনের অভিব্যক্তিতেও এই ধারাই দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে শাস্ত্রের পরিবর্ত্তে যদি সমাজের প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত বিধানাদিকে বসাইয়া দেই, তাহা হইলে—

যাহা প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত,
|
তাহার সত্যতা বা সনাতনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ,
|
সেই সন্দেহ নিরসনের জন্য বিচার,
|
এই বিচারের ফলে ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তের
পরস্পরের সঙ্গে সঙ্গতি,
|
আর সর্ব্বশেষে, এ সকল বিশিষ্ট সিদ্ধান্তের
সঙ্গে সার্ব্বভৌমিক যে বিশ্ব-সমস্যা
তাহার যথাযোগ্য সমন্বয়—

এই পঞ্চ অঙ্কে সমাজ-জীবনের অভিব্যক্তির ক্রমও ঠিক প্রকাশিত হইয়া থাকে। ফলতঃ, সমাজ-জীবনের বিকাশের ভিতরেও যে চৈতন্যের বা জ্ঞানের লীলা রহিয়াছে, ইহা মানিয়া লইলে এই পঞ্চ

পাদের অনুক্রমণ করিয়াই যে সমাজের ধারা রক্ষিত ও বিকশিত হয়, ইহা ত স্বীকার করিতেই হইবে। ফলতঃ ইহাই জ্ঞানের সার্ব্বজনীন ক্রম। জড়বিদ্যা, জীববিদ্যা, সকলেরই এই একই পন্থা। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হইয়া, জ্ঞানেতেই স্থিতি করিতেছে বলিয়া, বিশ্বের গতি এবং অভিব্যক্তি এই জ্ঞানের প্রকৃতির অনুসরণ করিয়াই চলে।

যাহা আছে, তাহাতে মানুষের চিরদিন কুলায় না। বাহিরে যাহা ব্যক্ত হয়, ভিতরে তার চাইতে ঢের বেশী অব্যক্ত থাকিয়া যায়। অভিব্যক্তির ধর্ম্মই ইহা। চিত্রকর যখন চিত্র আঁকেন, তখন তাঁর মনে যে রূপটা সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হইয়া আছে, তাহাকেই তিনি খণ্ড খণ্ড করিয়া ক্রমে ক্রমে আপনার চিত্রপটে ফুটাইয়া তুলেন। প্রতি মুহূর্ত্তেই তিনি চিত্রপটে যতটা ফুটাইয়া তুলেন, তাঁর নিজের চিত্তপটে তার চাইতে অনেক বেশী অপ্রকট থাকিয়া যায়। সমগ্র ছবিটা আঁকা শেষ হইলেও, তাঁর মনটা ফাঁকা হইয়া গিয়াই, যাহা আঁকা হইয়াছে তার চাইতে আরো বড় কি একটা যেন আঁধারে পড়িয়া আছে, এই ভাবে উদাস-পারা হইয়া উঠে। কবি, গায়ক,—সৃষ্টি যাঁরাই করেন, তাঁদেরই এই অভিজ্ঞতালাভ হইয়া থাকে। জ্ঞানের, প্রেমের, কর্ম্মের, সকল অভিজ্ঞতার ভিতরেই এই ব্যক্ত ও অব্যক্তের সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। আর অব্যক্তের সর্ব্ববিধ অভিব্যক্তিই স্বল্পবিস্তর এই ক্রমটার অনুসরণ করিয়া চলে।

এই ভাবেই বিশ্বের অভিব্যক্তি হইতেছে। ইংরেজিতে এই ক্রমটাকে—Thesis, Antethesis, Synthesis বলে। আমাদের শাস্ত্রীয় পরিভাষায় ইহাকে—তামসিক, রাজসিক, সাত্ত্বিক—এই ভাবে কতকটা ব্যক্ত করা যাইতে পারে। স্থিতির অবস্থাই জিনিসের

(Thesis) অবস্থা। স্থিতিতে গতিবেগ রুদ্ধ হইয়া পড়িয়া থাকে। ইহা একরূপ অসাড় অবস্থা। অসাড়তা তমের প্রধান ধর্ম্ম। সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার তম প্রলয়ের ধর্ম্ম। নিদ্রা ইহার লক্ষণ। আর প্রলয়-কালে বিধাতা যোগনিদ্রাভিভূত হইয়া কারণ-জলে শয়ন করিয়া রহেন, পুরাণে এই কাহিনী আছে। সুতরাং স্থিতি, থিসিস, আর তম, এই তিনই সমধর্ম্মাপন্ন। তার পর বিরোধ বা অ্যাণ্টিথিসিস্ বা রাজসিক অবস্থা। এই অবস্থাতেই ভেদ, বিদ্রোহ, সংগ্রাম, আত্মপ্রতিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। তার পর সমন্বয়ে, সিনথেসিসে, বা সাত্ত্বিক ভাবেতে সকল ভেদবিরোধের মীমাংসা হইয়া, সত্যের আপাত-পূর্ণতম রূপ প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই অবস্থাই আবার ক্রমে স্থিতিতে বা থিসিসে বা তমেতে যাইয়া দাঁড়ায়। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের সমন্বয় পরবর্ত্তী যুগের স্থিতি, পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের সিনথেসিস পরবর্ত্তী যুগের থিসিস,পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের সত্বই পরবর্ত্তী যুগে তম হইয়া পড়ে। তখন আবার বিকাশগতিকে অবিচ্ছিন্ন রাখিবার জন্য, বিরোধ, অ্যাণ্টি-থিসিস্ বা রাজসিকতার প্রয়োজন হয়। কিন্তু বিরোধ বিশ্বের প্রকৃতির মূল কথা নহে। বিরোধেতে এ সংসারে কোনও কিছু বেশী-ক্ষণ স্থিতি করিতে পারে না। তাই বিরোধটা পাকিয়া উঠিলেই সমন্বয়ের সূত্রপাত হয়;—অ্যাণ্টিথিসিস পুরা হইলেই সিনথেসিস্, আর রাজসিকতা প্রবল হইলেই সত্বের প্রভাব বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করে। এইরূপে পুনঃ পুনঃ এই ক্রম অনুসরণ করিয়া বিশ্ব বিকশিত হইয়া উঠিতেছে।

আমাদের এই "সনাতন" হিন্দুসমাজের জীবনেও এই সার্ব্বজনীন বিকাশ-ক্রমের ব্যতিক্রম হয় নাই। আমরাও এক দিন বর্ব্বর ছিলাম। ক্রমে সেই শৈশবের বর্ব্বরতা হইতেই বর্ত্তমানের সভ্যতায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এই দীর্ঘপথ হাঁটিতে অনেক যুগযুগান্তর কাটিয়া গিয়াছে। তম হইতে রজঃ, রজঃ হইতে সত্ব; স্থিতি হইতে বিরোধ বিরোধ হইতে সমন্বয়, থিসিস হইতে অ্যাণ্টিথিসিস, অ্যাণ্টিথিসিস হইতে

সিন্থেসিস,—বারম্বার এইরূপ করিয়া আমরাও ফুটিয়া উঠিয়াছি। যুগে যুগে আমরা নূতন জ্ঞান, নূতন শক্তি, নূতন প্রীতি, নূতন কর্ম্মের দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া আসিয়াছি। হিন্দুর সভ্যতা ও সাধনা বহুকাল পূর্ব্বে যে পূর্ণ পরিণতি পাইয়াছিল, তাহাই এতাবৎকাল চলিয়া আসিয়াছে, তার অপচয় বা সঞ্চয় আর কিছুই হয় নাই, একথা যে বলে, সে হিন্দুর ইতিহাস জানে না, হিন্দুর শাস্ত্র বুঝে না, হিন্দুর দর্শনের ক খ'এর জ্ঞান পর্য্যন্ত তার জন্মায় নাই। হিন্দু চিরদিনই মুক্তভাবে চলিতে চাহিয়াছে। এই মুক্তির জন্যই সে নিজেকে কতবার কত বাঁধনে জড়াইয়াছে, আবার এই বন্ধনের দ্বারা এই মুক্তিলাভ হইল না দেখিয়া নির্ম্মম ভাবে সকল বিধিনিষেধকে পায়ে ঠেলিয়া ফেলিয়াছে। এই কথাটা বুঝিলেই হিন্দু যে কোনও দিন অচলায়তন রচনা করিয়া তার ভিতরে বেশীদিন আপনাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই, এটা সুস্পষ্ট-রূপে বুঝা যায়। যুগে যুগে হিন্দু, যুগপ্রয়োজনকে অঙ্গীকার করিয়া, নূতন নূতন ধর্ম্মের, নূতন নূতন কর্ম্মের, নূতন নূতন বিধিনিষেধের, নূতন নূতন শাস্ত্র সংহিতার প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। যথা পূর্ব্বং তথা-পরং। যুগে যুগে যাহা হইয়া আসিয়াছে, এই যুগেই কি কেবল তার ব্যতিক্রম হইবে?

ব্যতিক্রম যে হয় নাই, পরমহংস রামকৃষ্ণ, প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, স্বামী দয়ানন্দ, ইহাঁরাই তার সাক্ষী।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।